জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রথম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা বুলেটিন নং-৬; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ ইং

সম্পাদকীয়

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সশস্ত্র সংগ্রামরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মুখপত্র জুম্ম সংবাদ বুলেটিন প্রকাশনার এক বছর পূর্ণ হলো।

জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় আন্দোলনের পটভূমি, বাস্তবতা, যৌক্তিকতা ও ঘটনাপ্রবাহ যথাযথভাবে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই বুলেটিনের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং আন্দোলনের কঠিন বাস্তবতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

উগ্র ধর্মান্ধ ও উগ্রজাতীয়তাবাদী বাংলাদেশর শাসক ও নিপীড়ক শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট মহা দুর্যোগ প্রবাহ জুম্ম জাতির উপর দিয়ে প্রতিদিন যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সেই নিদারুণ অসহণীয় জীবন ধারণের সময়ের বিচারের এই একটি বছর খুব কম সময় নয়। অবশ্য ক্ষেত্র, বিষয়গত দিক ও প্রেক্ষিতের বিচারে ৬টি প্রকাশনা কোন মতেই যথেষ্ট নয়। এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ জুম্ম জাতির কঠোর বাস্তবতা ও চরম প্রতিকূলতার কারণে উদগ্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনা সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয় নি। এই স্বল্প পরিসরে কঠোর বাস্তবতা প্রতিকূলতার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। একাত্মতা অনুভূতি ও উপলব্ধির মাধ্যমে বিদগ্ধ পাঠক মহল তা বুঝে উঠতে পারবেন।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও বিবিধ অনিবার্য কারণে বিষয়গত উপস্থাপনা, তথ্য পরিবেশনা বিষয় সজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসংগতি/ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তবে হৃদয়বান ও বিদগ্ধ পাঠক মহল থেকে পাওয়া উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, মতামত এবং সমালোচনা আগামী দিনে বুলেটিন প্রকাশনায় অমূল্য অবদান রাখতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এসব কিছুকে পাথেয় করে আগামী প্রকাশনাগুলোতে থাকবে সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া প্রভৃতি লেখা। তাই অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও প্রমাণ্য তথ্য সম্বলিত লেখা পাঠিয়ে বুলেটিন প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে বিদগ্ধ পাঠক মহলের কাছে অনুরোধ থাকলো।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও ইউনিটে কর্মরত দলীয় সদস্য, বিভিন্ন জেলা এমন কি বিদেশের অনেক সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের তথ্য পরিবেশন করে বুলেটিন প্রকাশনার কাছে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের এই সহযোগিতা বুলেটিনকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছে। শুভাকাংকী, বিদগ্ধ পাঠক মহল, নিবন্ধকার, প্রাবন্ধিক, লেখক ও তথ্য পরিবেশনকারী বন্ধুদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য সংবাদ বুলেটিনের আগামী সংখ্যাগুলো যথাযথ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামের পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করুক এটাই আন্তরিকভাবে কাম্য। সরকারের অপপ্রচার খণ্ডন ও হীনমুখোশ উন্মোচন করতে এই জুম্ম সংবাদ বুলেটিন তার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাবে। দৃপ্তপদে বুলেটিন এগিয়ে যাবে। এ গতি অপ্রতিরোধ্য।

মানবাধিকার লংঘনে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মানবাধিকার সংরক্ষণে বিশ্বের মানবতাবাদী সংগঠনগুলি আজ বড়ই সজাগ। আর তাইতো বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম যে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, সেই ব্যাপারে মানবতাবাদী সংগঠনগুলি গত নভেম্বরে'৯১ অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সম্মেলনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। গত ১৩ই নভেম্বর/৯১ইং বিবি সি সান্ধ্যানুষ্ঠানে পরিবেশিত সংবাদ প্রবাহ সূত্রে জানা যায় যে পার্বত্যাঞ্চলে পূর্বতম নাজুক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার পরিবর্তে জুম্মদের উপর সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন শতগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উক্ত পার্লামেন্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত দাতা দেশসমূহে কর্তৃক বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়টি বিবেচনা করার সতর্কবানী উচ্চারন করেছে। আর এই ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য দাতা সংস্থা দেশ সমুহের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে বলে ও উক্ত পার্লামেন্ট অভিমত ব্যক্ত করেছে।

এছাড়া সম্প্রতি হারারেতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে-ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। এ সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে পাবত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর বর্তমানেও বৈষম্যমূলক প্রশাসনিক কাটামো ও সামরিক সন্ত্রাস বলবৎ রয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জুম্ম জনগনের উপর মানবাধিকার লংঘনের জন্য দারুন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে এঅবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠনগুলি দাতা সংস্থা-সমূহকে অনুরোধ জানিয়েছে।

এসব মানবতাবাদী সংগঠন সমূহের মধ্যে "পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল কমিশন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩ জন জুম্ম হত্যা

বর্তমান ক্ষমতাসীন গনতান্ত্রিক সরকারের আমলেও নিরাপরাধ জুম্ম হত্যা অব্যাহত রয়েছে। অতি সম্প্রতি ৩ জন জুম্ম সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। জানা গেছে যে, গত ২০-১২-৯১ইং তারিখে শ্রী নিশি কুমার চাকমা (৪৬) পীং মঙ্গলা চাকমা, গ্রাম-লাম্বাছড়া (ছংড়াছড়ি মুখ) গরাইছড়ি মৌজা, মহালছড়ি উপজেলা, সেনাবাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তি ৪-১১-৯১ইং লেঃ কর্ণেল হানিফ ইকবাল (২৬ বেঙ্গল, মানিকছড়ি জোন) এর নিকট আত্মসমর্পন করে। এতে দেবলছড়ি বাজার পাড়া ক্যাম্প কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন হামিদ (৪১ বেঙ্গল, মানিকছড়ি কোন) তার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রতিশোধ হিসেবে ২০-১২-৯১ইং রাত্রে নিজ উঠোনে তাকে বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন উক্ত ক্যাম্প কম্যাণ্ডার রিপ্রূ মাষ্টার পীং সংপ্রু মার্গা ও থেঅংগ কার্ব্বারী পীং সুজাই কার্ব্বারীকে নিহত লাশ দাহ করার দায়িত্ব দেয়। উল্লেখ্য যে নিহত ব্যক্তির লাশটি তার পরিবার পরিজনকে ফেরত দেওয়া হয়নি। এ হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য উক্ত ক্যাম্প কম্যাণ্ডার ২৪-১২-৯১ইং তারিখে লাম্বাছড়া, কলাছড়ি ও চংড়াছড়ি গ্রামের ৪০/৫০ জনকে এই মর্মে দস্তখত দিতে বাধ্য করে যে, নিশি কুমার চাকমা শান্তি বাহিনীর কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল।

উক্ত নিশি কুমার চাকমাকে হত্যা করে ক্যাপ্টেন হামিদ রক্ত হত্যার নেশায় আরও উন্মত্ত হয়ে ২৭-১২-৯১ইং তারিখে আবার একই গ্রামবাসী শ্রী [illegible] কুমার চাকমা (৩৫) কে (পীং-নন্দী কুমার চাকমা) তার খামার বাড়ী কলাছড়িতে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠোনে গুলি করে হত্যা করেছে ঐ দুই ব্যক্তির হত্যার ফলে এলাকা বাসীরা অত্যন্ত নিরাপত্তাহীন অবসস্থায় ভীত ত্রস্ত হয়ে দিনাতিপাত করছে।

এছাড়া ৫/২/৯২ইং তারিখে পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের রায় রঞ্জন কার্বারী পাড়াতে একদল আর্মি গিয়ে গ্রামটি ঘেরাও করে এবং নির্বিচারে এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। এতে নিরাশা দেবী চাকমা (১৭) পী-বৃহৎ চন্দ্র চাকমা নাম্নী এক বালিকা মারা যায় বলে জানা গেছে।

ত্রান সামগ্রী সেনা বাহিনীর উদরস্থ

তথাকথিত উন্নয়ন, পুনর্বাসণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই পকেটস্থ করে সন্তুষ্ট থাকতে নাপেরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি গ্রস্তদের দেয়া ত্রান সামগ্রী উদরস্থ করার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেনা কমকর্তারা।

গেল বছরের এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘর্ণি ঝড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯% জুম্ম ক্ষতিগ্রস্থ হন। বিদেশ প্রাপ্ত ত্রান সামগ্রীর অতি নগন্য অংশই ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এসব ত্রান সামগ্রী মধ্যে কুয়েতী টিনজাত মাংস ও বেবী স্যুট খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে বিধ্বস্থদের নিকট বিতরণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু যেই মাত্র না টিনজাত মাংসের বিষয় স্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের গোচরে যায় তখন সেনা কর্মকর্তারা তাদের লোলুপ দৃষ্টি সংবরণ করতে পারেনি। তাই সেনা কর্মকর্তরা বিতরণকৃত টিনজাত মাংস সেনা ক্যাম্পে ফেরত দেয়ার জন্য ইউ পি চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দেয়। সেনা কর্মকর্তাদের এই আদেশ অমান্য করার কোন উপায় নেই। তাই বেচারা ইউ পি চেয়ারম্যানগণ উল্লেখিত দ্রব্য সামগ্রী বিধ্বস্থদের নিকট বিতরন বন্ধ করে ১৬/১১/৯১ তারিখে খাগড়াছড়ির ২০৩ ব্রিগেডের আওতাধীন মহাজন পাড়ার কাছাকাছি জোনা হেড কোয়ার্টারে জমা দিতে বাধ্য হন।

এক নিরীহ জুম্ম পরিবারের ধর্মান্তর

জুম্ম অধ্যুষিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার হীন প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমতল এলাকা থেকে ব্যাপক হারে মুসলমান বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি দানের সাথে সাথে আর্থিক প্রলোভনে,

ভীতি প্রদর্শন ও বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করণের ঘটনা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অহরহ ঘটছে। নিম্নে অনুরুপভাবে সংঘটিত ধর্মান্তর করণের এক ঘটনার বিবরণ দেয়া গেল—

রাংগামাটি পার্ব্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলার ৯৭ নং মুবাছড়ি মৌজাস্থ ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নের উগলছড়ি গ্রামে বসবাসরত মনোরাম চাকমার এক নিরীহ জুম্ম পরিবার। উক্ত পরিবারের কর্তা মনোরাম চাকমা ও তার পরিবারকে শান্তি বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্টতার মিথ্যা অজুহাতে বেশ কয়েকবার সেনা-বাহিনীর কর্তৃক নির্যাতনের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহনের চাপ দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উক্ত জুম্ম পরিবারটি স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে।

গত ১৭-১০-৯১ইং তারিখে ঘাগড়া জোন কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার হোসেন (৫ম বেঙ্গল) এর বিশেষ উদ্যোগে কাউখালী মসজিদ কমিটির সহযোগিতায় কাউখালী উপজেলা মেজিষ্ট্রেট সিদ্দিকুর রহমানের কোর্টে উক্ত জুম্ম পরিবারকে বৌদ্ধ থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা হচ্ছে—

১। মনোরাম চাকমা (৬৫) পীং মৃত বেগেনা পেদা চাকমা- ইসলামী নাম-মোঃ আবদুল রহিম।

২। মঙ্গলমুখী চাকমা (৫৫) স্বামী মনোরাম চাকমা - ইসলামী নাম - ছায়েরা বেগম

৩। নিশি কুমার চাকমা (৩৫) পীং মনোরাম চাকমা - ইসলামী নাম মোঃ আবদুল খালেক

৪। শেষ কুমার চাকমা (৩৫) পীং মনোরম চাকমা - - ইসলামী মোঃ আবদুল খালেক

৫। সূর্য দেবী চাকমা (২৭) স্বামী - শেষ কুমার চাকমা - ইসলামী নাম নুরজাহান বেগম

৬। নব কুমার চাকমা (৭) পীং শেষ কুমার চাকমা - ইসলামী নাম মোঃ সোহরাব হোসেন

৭। সক্রিয় চাকমা (২) পীং শেষ কুমার চাকমা - ইসলামী নাম মোঃ আব্দুর সোবহান

৮। বাসনা দেবী চাকমা (৭ মাস) পীং শেষ কুমার চাকমা ইসলামী নাম রীণা আক্তার

ধর্মান্তরের পর উক্ত পরিবারকে ঘাগড়া আর্মি ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে অনুপ্রবেশকারীদের পাশে বসতি দেয়া হয়েছে।

ত্রান কমিটি কর্তৃক ত্রান সামগ্রীর গুদাম ভস্মীভূত

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদেরকে পৈতৃক বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদমূলক প্রকল্প 'শান্তিগ্রাম', 'গুচ্ছগ্রাম', বড়গ্রাম নামক প্রভৃতি বন্দী শিবিরে জোর পূর্বক পুনর্বাসন এবং স্বত্যাগত শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনের নামে বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর আত্মসাতের ঘটনা একদিনের নয়। জুম্ম উচ্ছেদ মূলক এই সমস্ত প্রকল্প সমূহের সুচনালগ্ন থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার দেশী ও বিদেশী ত্রাণ সাগ্রী আত্মসাতের মাধ্যমে সেনাবাহিনী, সরকারী আমলা এবং ত্রান ও পুনর্বাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কমকর্তারা নিজেদের উদর পূর্ত্তি করে আসছে ও প্রশাসনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিতে কসুর করছে না। গত ১৯শে জুলাই' ৯১ইং নানিয়াচর উপজেলার ত্রান সামগ্রীর গুদাম ভস্মীভূত করন এর এক উজ্জল প্রমান বহন করছে।

উক্ত গুদামে জুম্মদেরকে পুনর্বাসনের নামে গচ্ছিত ত্রাণ সামগ্রী সমূহ যাবতকাল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরাই ভোগ করে আসছে। এবারেও মোটা অংকের ত্রান সামগ্রী আত্মসাত করার পর আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার অবস্থা সৃষ্টি হলে এতদসংগে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের এক গোপন সিদ্ধান্তক্রমে খালি গুদাম রাত্রিতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ সরকার আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক শান্তিগ্রাম - বড়গ্রাম - গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলেছে, যে সব গ্রামে জুম্ম জনগণ শান্তিতে বসবাস করবে। সুখে জীবন যাপন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ যে আন্দোলনের নামে অশান্তি বিরাজ করছে, সেই অশান্তি এ সব গ্রামকে স্পর্শ করবে না। এ সব শান্তিগ্রাম - বড়গ্রাম গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সেনা কমান্ডাররা জুম্মদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কার্বারী, মেম্বার, চেয়ারম্যানকে বুঝিয়েছে, বার বার মিটিং করেছে, ঢাকঢোল

প্রসংগ: শান্তিগ্রাম-বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রাম

বাংলাদেশ সরকার আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক শান্তি-গ্রাম-বড়গ্রাম গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলেছে, যে সব গ্রামে জুম্ম জনগণ শান্তিতে বসবাস করবে। সুখে জীবন যাপন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ যে আন্দোলনের নামে অশান্তি বিরাজ করছে, সেই অশান্তি এ সব গ্রামকে স্পর্শ করবে না। এ সব শান্তি-গ্রাম-বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সেনা কম্যাণ্ডাররা জুম্মদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কার্ব্বারী, মেম্বার, চেয়ারম্যানকে বুঝিয়েছে, বার বার মিটিং করেছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির কুঞ্জ এ শান্তিগ্রাম-

বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রাম। পাতা মারা সবুজ রঙের পোষাক পড়া সেনা কম্যাণ্ডাররা শান্তির দূত সেজে শান্তি নামক বস্তুটি জুম্মদের মাঝে আকাতরে বিলিয়ে দিতে চাই। তারা যেন জুম্মদের কত আপনজন! কতো শুভাংখী! তারা শান্তি দূত। খাগড়াছড়ি জেলা প্রধান তথাকথিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমিরণ দেওয়ানের ভাষায় - "নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের আপন ভাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যাদের জন্ম এই পার্বত্য জেলা থেকে অনেক দূরে, যারা আমাদের পরিবেশের সাথে আদৌ সম্পর্শে নয়, তারা আজ হাজারো কষ্ট সহ্য করে আমাদের জান মালের নিরাপত্তা তথা অঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহমান রেখে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে"

সরকারের শান্তি বিতরণের এ পদক্ষেপ কোন কাল্পত কাহিন নয় প্রহসনও নয়, কোন নাটকের কৌতুকাভিনয় ও নয় এটা সরকারের সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত এক অশুভ উদ্যোগ ও ঘৃন্য পদক্ষেপ। জুম্ম জনগণকে গ্রামবন্ধী করার এক অশুভ ষড়যন্ত্র। সাম্প্রতিককালে শান্তিগ্রাম বড়গ্রাম গড়ে তুললেও এ সব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরো অনেক আগের ঠিক ১৯৭৫ শালে গড়ে তোলা হয় রেংখ্যং এলাকায় অনেক আদর্শগ্রাম ও যুক্তগ্রাম তথা গুচ্ছ-গ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যোলালিত অবাধ ও স্বাধীন জুম্মচাষীদের উন্নতির নামে গড়ে তোলা হয় সেই গ্রাম-গুলো। পাহাড়ে পর্বতে আনাচে-কানাচে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুক্ত জুম্মদের বাধ্য করা হয় এসব গ্রামে আসতে। জুম্মরা এসব গ্রামে আসতে নারাজ। যহেতু এসব গ্রামে জেল খানার কয়েদীর মত গাদাগাদিভাবে বাস করা তাদের স্বভাব নয়, সম্ভব ও নয়। তাছাড়া জুম্মচাষের ক্ষেত্রে এভাবে অবস্থান করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সরকারের বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা। তাই জুম্মদেরকে বাধ্য করা হয় গুচ্ছগ্রামে আসতে। গড়ে উঠে অনেক গুচ্ছগ্রাম। গ্রামবাসী জুম্মদেরকে ঘরবাড়ী তোলার জন্য কিছু টাকা সহ কয়েক সপ্তাহের খোরাকী দেয়া হয়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র দেয়ার গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা। কিন্তু স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র দেখার ভাগ্য জুম্মদের কপালে জুটেনি। তাদেরকে কয়েক সপ্তাহের রেশন প্রদানের পর সরকার রেশন বন্ধ করে দেয়। জুম্ম জনগণ বিপাকে পড়ে যায়। তাদেরকে গ্রামের বাহিরে যেতে দেয়া হয় না। তারা বনে জংগলে গিয়ে বন্য ফলমূল, আলু সংগ্রহ করতে পারে না। অন্য কোথাও গিয়ে রোজগার করতে পারে না। ফলে গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তারা সরকারের উপর নির্ভর-শীল হয়ে পড়ে। সরকার এ সুযোগে সদ্ব্যবহার করে। পুরুষদেরকে দিয়ে সেনা ছাউনী, চলাচলের রাস্তা, খাদ্যদ্রব্যবহন প্রভৃতি কাজ দিনের খোরাকীর বিনিময়ে করাতে থাকে। পুরুষরা দিনের বেলায় কাজে গেলে সেনারা গ্রামে ঢুকে জুম্ম মেয়েদের সাথে প্রেমালাপ শুরু করে দেয়। টাকার লোভে ও বন্দুকের নল দেখিয়ে অনেক মেয়ের সতীত্ব হরণ করে। অপহরণ ও ফুসলিয়ে বিয়ে করে অনেক জুম্ম অসহায় নারীকে। এসব অনাচারের প্রতি-বাদ করলে বা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাইলে আর কোন উপায় থাকে না জুম্মদের। শান্তিবাহিনীর চর, দুষ্কৃতিকারী, দেশদ্রোহী নানা আখ্যায় ভূষিত করে চলে মারধর, নির্যাতন। ক্যাম্পে নিয়ে মাটির গর্তে না খাওয়ায়ে রেখে কংকাল বানিয়ে করুণা দেখিয়ে ছেড়ে দেয় শেষে। এ যেন এক প্রেতপুরী! এটা কোন অরব্য উপন্যাসের উপাখ্যানের কোন রাক্ষসপুরীর কথা নয়। কোন রহস্যময় লেখকের কোন রহস্যপুরী বর্ণনাও নয়। গুচ্ছ গ্রামের একদম বাস্তব অবস্থা।

গুচ্ছগ্রামের এ অবস্থা দেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জন-গণ শিহরিত হয়ে উঠে। কি এক নারকীয় পরিবেশ! এই নারকীয় পরিবেশের তীব্র প্রতিবাদ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে সংগ্রামরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের নামে জুম্ম জনগোষ্ঠির নির্যাতনের শিবির গুচ্ছগ্রামের রহস্য দেশর ও বিশ্বের মানবতাবাদী জনগণের নিকট তুলে ধরে। প্রকাশিত হয় গুচ্ছগ্রামের নারকীয়তা। বাংলাদেশ সরকারের ঘৃন্য ও জঘন্য মুখোস উন্মোচিত হয়। বিশ্বের মানবতাবাদী জনগণ এ নারকীয় দৃশ্য দেখে নিরব থাকতে পারেননি। এসব গ্রামকে ভিয়েত নামে সৃষ্ট নির্যাতনের শিবির (Strategic Village) হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বিশ্ব জনমত গড়ে উঠে গুচ্ছগ্রাম গড়ার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ নিন্দিত হয় মানবতার লংঘনকারী হিসেবে। অবশ্য গুচ্ছগ্রাম, যুক্তগ্রাম গড়ে তোলার প্রথম থেকে জনসংহতি সমিতি এই পরিকল্পনার চরম বিরোধীতা ও নিন্দা জ্ঞাপন করে আসছে এবং জুম্ম জনগণকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে।

সেই গুচ্ছগ্রাম যুক্তগ্রামকে পালটিয়ে আজ বড়গ্রাম ও শান্তিগ্রামে পরিণত করেছে বাংলাদেশ সরকার। যেহেতু গুচ্ছগ্রাম বা যুক্ত গ্রাম নিন্দনীয়, তাই আর গুচ্ছ বা যুক্তগ্রাম নয়, এবার গড়া হয় চাকমাদের জন্য শান্তিগ্রাম ও ত্রিপুরা এবং মারমাদের জন্য বড়-গ্রাম। এ যেন ময়ুর পেখম পড়িয়ে কাককে ময়ুর বলে দেখানো।

শান্তির গ্রাম-বড় গ্রাম দিয়ে গুচ্ছগ্রামের অবতারণা। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট মতে শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় ৮টি বড়গ্রাম ও ১৬টি শান্তিগ্রাম রয়েছে যেখানে জুম্মরা জীবন যাপন করছে। আর সমতল জেলার থেকে অনুপ্রবেশকারী-দের জন্য ১০৯ টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে এসব শান্তিগ্রাম-বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে—Cluster vill ge were referred to as 'concentration camps' and one person summed up the feelings of ma y hill peoples as follows:

'To live in a cluster village and to live in jail is the same story:

এশান্তি বা বড়গ্রাম গুচ্ছগ্রামগুলো সেনা বাহিনীর ক্যাম্পের চারপাশে ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে গড়েতোলা হয়। বর্তমানে এসব গ্রামে নিম্নোক্ত শ্রেনীর জুম্মরা অবস্থান করছে।

১) জুম্মদের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সরকারের লেজুর ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী।

২) বনে জংগলে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অসহায় ও নিরীহ জুম্ম জনগণ (যাদের কে বাধ্য করা হয়েছে)।

৩) আন্দোলন হতে বিচ্যুত আত্মসমর্পিত প্রাক্তন শান্তি বাহিনীর সদস্যরা।

৪) সরকারী দালাল কর্তৃক প্ররোচিত ভারতের শিবির থেকে প্রত্যাবর্তিত জুম্মরা।

শান্তিগ্রাম বড়গ্রাম গুচ্ছগ্রাম গঠনের সরকারের উদ্দেশ্য হলো —

১) জুম্মদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন করা।

২) শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

৩) শান্তি বাহিনীর বিরোধী সরকারী লেজুর ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

৪ জুম্ম জাতীয়তাবোধ নষ্ট করে জুম্মদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা।

৫) আন্দোলন সমর্থনকারীদের গ্রামবন্দী ও নির্যাতন করা।

৬) নিজ জমি ও বাস্তুভিটা থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ করে অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

৭) জুম্মদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে সরকারী অনুকম্পার মুখাপেক্ষী করা।

৮) অনুপ্রবেশকারীদের সাথে জুম্মদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের নমনীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটানো।

৯) জুম্মদেরকে বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণে প্রভাবিত করা।

১০) ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত ও মুসলমান বানানো।

১১) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করেছে, এই প্রচারণা চালিয়ে বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করা।

১২) জেলা পরিষদের প্রতি জুম্মদের সমর্থন আদায় ও জেলা পরিষদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ৪ লাখ মুসমান বাঙ্গালীকে পুনর্বাসন করা।

১৩) জুম্মদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারে সদিচ্ছা প্রমাণ করা।

১৪ উপরোক্ত সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিশেষ পরিস্থিতিতে জুম্মদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করা।

শান্তি - বড় - গুচ্ছগ্রামে জুম্মরা কেমন আছে ?

১) বিভিন্ন অভিযোগে নির্যাতীত ও গুম হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্থ।

২) নিজের মা- বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন ও অপহরনের আশংকায় শংকিত।

৩) সরকারের ঘৃন্য ও জঘন্য কার্য করতে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কিত।

৪) অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। অন্ন, বস্ত্র শিক্ষাও চিকিৎসার অনিশ্চয়তা।

৫) গাদাগাদিভাবে বাস করা, ঝগড়াঝাটি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও রোগ শোক বৃদ্ধি।

৬) কোন বাক স্বাধীনতা নেই।

৭) চলাচলের কোন স্বাধীনতা নেই।
৮) নিজের জমি চাষাবাদ করার কোন অধিকার নেই।
৯) ধর্মীয় স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত।
১০) বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাব।
১১) মুসলমান বানানোর আশংকা।
১২) প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিযোগের ভয়ে ভীত
১৩) বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বিচারে অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শান্তিগ্রাম- বড়গ্রাম গুচ্ছগ্রাম গঠনে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং এসব গ্রামে বসবাসকারী জুম্মদের অসহায় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নিজ বাস্তুভিটা হতে উদ্বাস্তু জুম্মরা এসব গ্রামে আজ অনাহারে -অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, চাষাবাদ-হীনতা, ক্রয় বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে এসব গ্রামে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। বিগত বছরে অনাহারের কতজন জুম্ম ৮২ লীলা সাঙ্গ করেছে তার খবর রাখে কে? তাই শান্তি গ্রাম-বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রাম একদিকে অসহায় ও নিরীহ জুম্মদের জীবনে এনেছে চরম বিপর্যয় হতাশা, বঞ্চনা ও জীবনের অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সমস্ত জুম্মদের মধ্যে এনেছে বিভেদ, বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি, প্রতিক্রিয়াশীল, আপোষকামী ও পরনির্ভরশীল মনোভাব যা জুম্মদের অধিকার আদায়ে আন্দোলনে বিভিন্নভাবে বাঁধা সৃষ্টি করছে। আর স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক, ধর্মান্ধ, উগ্রজাতীয়তাবাদী সরকার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল, স্বার্থান্ধ, তুলা লেজ্গর গোষ্ঠীদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে। অবশ্যই এই শান্তিগ্রাম-বড়গ্রাম প্রতিষ্ঠার শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক নেই, এর ইতিবাচক দিকও রয়েছে। ইতিবাচক দিকগুলো হলো — শান্তিগ্রাম বড়গ্রাম গঠনের সরকারেরর উদ্দ্যেশ্য আজ জুম্ম জনগণের আর অজানা নয়। শান্তিগ্রাম- বড়গ্রামে অবস্থানকারী জুম্মদের অবস্থা আজ সকলের নিকট আয়নার প্রতিচ্ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিক্রিয়াশীল, লেজুর ও তুলাগোষ্ঠী আজ চিহ্নিত। সরকারের শান্তির কপোতের মুখোস উন্মোচিত। জেলা পরিষদের মোহ আজ নির্বাপিত। তাই জুম্ম জনগণ হয়ে উঠেছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতি সচেতন, অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে জংগী, সংগ্রামী, নিজ অধিকার আদায়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জুম্ম জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এবার সামনে এগোনোর পালা, জুম্ম জনতা সচেতন হয়ে উঠেছে — তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগোচ্ছে।

মানবাধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, শীর্ষক প্রবন্ধ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

৪৩ তম জাতিসংঘ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গত ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (বামাক) ও দি ইনষ্টিটিউট অব রুরাল জার্নালিষ্টস এর উদ্যোগে ঢাকাস্থ ইনিজ্ঞনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার বিষয়ের উপর এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দৈনিক গিরিদর্পণ ও সাপ্তাহিক বনভূমির সম্পাদক ও প্রকাশক এবং রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবের সভাপতি এ, কে, এম মুকছুদ আহম্মদের লেখা 'মানবাধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি সেমিনারের মূল প্রবন্ধ হিসেবে গঠিত হয়। সঙ্গত কারণেই উক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উত্থাপণ করা গেল।

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানতে অগ্রহী প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে কৌতুহলী হবেন। কিন্তু প্রবন্ধের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেককেই হতাশ করবে। কেননা মানবাধিকার বিষয়ক প্রবন্ধের না বলে এটাকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জনভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামের আত্মনিবেদিত শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার কাহিনী বলাই শ্রেয়। প্রাবন্ধিক সাহেব গোড়াতেই উল্লেখ করেছেন - "স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা খুন, নির্যাতন চলছে। নিরপরাধ পার্বত্য নাগরিকের প্রান দিতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতীয়দের পক্ষ থেকেই এই হত্যাকাণ্ড চলছে।"

নিখুঁত কলাকৌশলে যে ভাবে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে কুৎসা রটনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, আশাকরি প্রাবন্ধিক সাহেব একজন উর্বর মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন লোক হবেন। এমন লোকদের মোটেই ভুলবার কথা নয় যে, স্বাধীনতা উত্তরকাল

কে বা কারা সর্বপ্রথম পানছড়ি, পেরাছড়া ও দিঘীনালার নিরপরাধ পার্বত্য নাগরিকদের উপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং কোন বাহিনী বা পক্ষ সর্বপ্রথম বাঙ্গরবানে বোমাং চীফকে জনসমক্ষে নির্যাতন ও অপদস্থ করেছে। প্রাবন্ধিক সাহেব একজন বহিরাগত হলেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন। এবং নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মুক্তি বাহিনীরাই সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, খুন, নির্যাতন প্রভৃতি মানবাধিকার বিরুদ্ধ হীন কার্যকলাপ চালিয়েছে। জুম্ম জনগণ তৎসময়ে পানছড়ি হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা মুক্তি বাহীনীর কম্যাণ্ডার বাবুল চৌধুরী, বর্তমান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য দোস্ত মোহাম্মদ, ই. পি আরের সুবেদার খয়েরু জ্জামান ও হাবিলদার তাজুল ইসলাম প্রমুখদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করেও কোন সুবিচার পায়নি।

১৯৮১ সনের ২৫ শে মার্চ কলম পতি ইউনিয়নের বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর জোয়ানরা ধর্মপ্রাণ ও সরলমতি জুম্মদের পোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের অজুহাত দেখিয়ে ডেকে এনে বিনা উষ্কানীতে এই নির্মম ও নৃসংশ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রাশেদ খান মেনন (ওয়ার্কাস পার্টি), শাজাহান সিরাজ (জাসদ), উপেন্দ্র লাল চাকমা (জাসদ) প্রমূখ তৎকালীন এম পিত্রয় কতৃক যেমন তদন্ত করেছেন তেমনি তিনিও সরেজমিনে ঘটনাস্থল ও নিহত জুম্মদের গণ কবর পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়েছেন। তিনি যখন ঘটনাস্থল দেখতে যান, সেই সময়ও সামরিক হেলিকপ্টার থেকে জুম্ম গ্রাম সমূহে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ চলছিল ও অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছিল। উপরোক্ত এম পিত্রয়ের প্রকাশিত তদন্তের রিপোর্টও তিনি নিশ্চয়ই অনেকবার আত্মস্থ করেছেন। প্রাবন্ধিক সাহেব কিন্তু ঐ সব প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনাবলীর বিন্দু বিসর্গ ভুলেও উল্লেখ করেননি। সরকারী অপপ্রচারের ভাড়াটে প্রাবন্ধিক মেকি মানবতাবাদী কর্মী ও জুম্ম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন লোক না হলে এমন প্রত্যক্ষদর্শী অমানবিক জাজ্জল্য ঘটনা লুকাবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

তিনি বলেছেন যে, ৪ঠা মে ১৯৮৯ সালে লংগদুতে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিলে হয়তো দুঃখজনক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতো না— মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি যথেষ্ট মায়াকান্না করেছেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী বলতে বলতে তিনি আজ কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। নিরাপত্তা বাহিনীরই উস্কানীতেই এবং নিরাপত্তা বাহিনীরই একটি সশস্ত্র বাহিনী ভি ডি পিদের দ্বারাই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং নিরাপত্তা বাহিনীর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংবিধান বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার স্বাধীনতা — সার্বভৌমত্বের হুমকি প্রতিরোধ করা এবং জন নিরাপত্তায় স্বার্থে সরকার এখানে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করেছে। 'শান্তি বাহিনী তথ্য জনসংহতি সমিতি কখনোই বিচ্ছিন্নতার ধোঁয়া বা স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বের হুমকি স্বরুপ কোন শ্লোগান আজ অবধি তুলেনি। তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উথাপণ করেছে মাত্র। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তন আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোতে স্বীকৃত।

তিনি লিখেছেন- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল অনুযায়ী বহিরাগতদের স্থায়ী বসবাসের নিষেধাজ্ঞার

বিধান বলবৎ থাকলে সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত নাগরিক অধিকার খর্ব হতো। লেখক সাহেব একজন পণ্ডিত ব্যক্তি (?)। তার নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা যে, জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের বৃহত্তর মুসলমান বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক ও স্বতন্ত্র স্বত্বার অধিকারী এবং পৃথক শাসন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতীত জুম্ম জনগোষ্ঠীর বিশিষ্টতা সমুন্নত রাখা এবং বিকাশ ঘটানো অসম্ভব। তার প্রেক্ষাপটেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক শাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা মৌলিক ও মানবিক সম্মত। এতে মুসলমান বাঙালী জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা এর ফলে মুসলমান বাঙালী অধ্যুষিত দেশের ৯০% অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন বিঘ্নিত হচ্ছে না। পক্ষান্তরে বরং জুম্ম জনগনের বিশিষ্টতা সংরক্ষণের মৌলিক ও মানবিক অধিকারকে সন্দেহাতীতভাবে খর্ব করে। বৃহত্তর মুসলমান বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রবল আগ্রাসনে জুম্ম জনগনের বিশিষ্টতা তথা জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে তা বলাই বাহুল্য। অপর জনগোষ্ঠীর অধিকারকে খর্ব করে নিজের অধিকার দাবী করা কোন ক্রমেই মানবিক সম্মত হতে পারে না।

নাম সর্বস্ব পার্বত্য জেলা পরিষদের ২৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, '— কোন জায়গা জমি এই জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নহেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না —।" বিশেষ ও সংরক্ষিত বিধানের বলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব হলে নিঃসন্দেহে উক্ত বিধান বলেও খর্ব হতো। জুম্ম জনগনের বিশিষ্টতার আলোকে উক্ত বিধান পূর্ণাঙ্গ না হলেও গ্রহন করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ফেডারেল পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে প্রাবন্ধিক সাহেব নিশ্চয়ই ভুলে যান নি?

জন নিরাপত্তার জন্যই সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে বলে তিনি বলেছেন। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব স্বাধীনতা - সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ নিঃসন্দেহে তাই। কিন্তু জাতীয় পবিত্র আমানত সেই সেনাবাহিনীকে যদি স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অপব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেনাবাহিনী যদি তার পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় ও জনগনের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তাহলে স্বভাবতই সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। প্রাবন্ধিক সাহেবের ভালই জানা আছে যে — প্রশাসন ও অনুপ্রবেশকারীদের যোগসাজসে সেনাবাহিনী ১৯৮১ সনে কলমপতি হত্যাকাণ্ডে ৩০০ জন, মাটিরাংগা - বেলছড়ি হত্যাকাণ্ডে ৫০০ জন, ১৯৮৪ সনে ভূষন ছড়া হত্যাকাণ্ডে ২৬ জন ১৯৮৬ সনে রামবাবু ডেবা হত্যাকাণ্ডে ৪২ জন পানছড়ি - তবলছড়ি - মাটিরাংগা - দীঘিনালা হত্যাকাণ্ডে ৫০ জন, চংড়াচড়ি হত্যাকাণ্ডে ১৮ জন, ১৯৮৮ সনে কাচালং এর বাঘাইছড়ি হত্যাকাণ্ডে ৩০ জন, এবং ১৯৮৯ সনে লংগদু হত্যাকাণ্ডে ৩২ জন সর্বমোট ১,০১২ জন নিরাপরাধ জুম্মকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সেই সাথে করেছে শত-শত জুম্ম ঘর - বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, জুম্ম নারী ধর্ষন ও ধর্ষনের পর হত্যা ধন - সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি মানবাধিকার বিরোধী হীন কার্যকলাপ। এসব পাইকারী গনহত্যা ছাড়াও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক অহেতুক ধরপাকড়, জেল - জুলুম, জিজ্ঞাসাবাদ, চলাচল ও বেচাকেনায় বিধি নিষেধ, অমানবিক অত্যাচার প্রভৃতি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিত্যনৈমিত্তিক সংঘটিত করা হচ্ছে এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার জুম্ম আজ উদ্বাস্তু, পঙ্গু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রিত, তথাকথিত শান্তিগ্রাম - বড়গ্রাম

আদর্শগ্রাম - গুচ্ছগ্রাম নামক প্রভৃতি বন্দী শিবির ও কারাগারে বন্দী এবং অনাহারে - অর্ধাহারে নিমজ্জিত প্রাবন্ধিক সাহেব নিরাপত্তা বাহিনীর ঐসব মানবাধিকার বিরুদ্ধ শ্বেত সন্ত্রাস সম্পর্কে বিন্দু মাত্র উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ তিনি ঐসব কার্য কলাপকে মানবাধিকার লংঘনের পর্য্যায়ে বিবেচনা করেন না এবং জুম্ম জনগনের উপর ঐসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে নিরাপত্তা বাহিনীর মৌলিক দায়িত্ব ও মানবাধিকার সংরক্ষণ বলে বিবেচনা করেন। তিনি অবশ্য ১৯/১০/৯০ ইং তারিখে ১৪. জন জুম্ম কিশোরীকে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষনের ঘটনাকে কিঞ্চিৎ তুলতে চেয়েছেন কিন্তু তাও আবার এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। পাশ কেটে যাওয়ার অবশ্য সঙ্গত কারনও আছে। সত্য কথা বলতে গিয়ে পাছে নিরাপত্তা বাহিনীর তাজা বুলেট যদি তার দিকে ধেয়ে আসে ? বেচারা প্রাবন্ধিক সাহেবের হাজার হোক মৃত্যুর ভয়ও তো আছে ? তিনি উল্লেখ করেছেন যে - "সন্ত্রাসী কর্তৃক নিরীহ নাগরিককে খুন করার বিষয়টি অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান।" এড়িয়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারন আছে। যারা জনগনের জমি ও উৎপাদিত ফসল জোর করে কেড়ে নিচ্ছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ধন- সম্পত্তি লুটপাত করছে, পর পর ৮টি গনহত্যা সংঘটিত করেছে, যাদের হাতে নিরাপত্তা বাহিনী অস্ত্র তুলে দিচ্ছে, সেই অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা কোন্ যুক্তিতে নিরীহ বিবেচিত হবে এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে না তা বোধগম্য নয়। বলাবাহুল্য এসব হত্যাকাণ্ড ও লুটতাজে অনুপ্রবেশকারী নারী এবং কিশোর - কিশোরীরাও কম এগোয় না। কাচালং জুম্ম গনহত্যায় কাচালং কলেজের জুম্ম ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়েছে ঐ অনুপ্রবেশকারীদের কিশোর বয়সী ছেলেরাই।

তিনি উল্লেখ করেছেন। "শান্তি বাহিনীই প্রকারান্তরে সরকারকে সেনাবাহিনী পাঠাতে বাধ্য করছে।" সামরিক উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে সত্য কথা। কিন্তু তার আগে বিবেচনা করতে হবে - কি কারনে শান্তি বাহিনীর সৃষ্টি এবং তার পিছনে মূল সমস্যাটা কোথায় ? যে অন্তর্নিহিত কারনে শান্তি বাহিনী তথা জুম্ম জনগনের সশস্ত্র আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছে, তার স্থায়ী সমাধান ব্যতীত সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তা সমাধান হতে পারেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এটাকে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় পর্য্যায়েই সমাধান করতে হবে। আলোচনায় অংশ গ্রহনকারী আইনজীবি সামশুল হক চৌধুরী জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা অবদুল সামাদ আজাদ, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব মোঃ সামছুল ইসলাম দিলদার প্রমুখ আলোচকেরা প্রত্যেকেই সেমিনারে ঐ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

তিনি যেমন বলেছেন — পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ,—শান্তি বাহিনী তথা জুম্ম জনগনও তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। সেই সাথে এটাও বিশ্বাস করে যে- বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে জুম্ম জনগনের পৃথক স্বকীয় বিশিষ্টতা রয়েছে এবং সেই আলোকে একই সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের অধীনে পৃথক স্ব- শাসনের ন্যায্য দাবীদার। তাই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বভাবতঃই পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র আন্দোলনের প্রশ্ন এসে পড়ে। অথচ তিনি বলেছেন— পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের কোন অবকাশ নেই ও জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে নাই। প্রাবন্ধিক সাহেব এতই আবেক প্রবণ হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন যে তিনি কোথায় কি স্ববিরোধী প্রলাপ বকছেন তা খেয়াল রাখতে পারেননি। সাপ্তাহিক পার্বতীর ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "আর্থসামাজিক উন্নয়নে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন প্রসংগ" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে "এরা তৃতীয় শ্রেনীর নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করছিল। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর পার্বত্য বাসীর মনে পুনঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। তাদের মৌলিক অধিকার সমূহ আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শীতা ও দমনমুলক নীতির কারণে সেই সংগ্রাম পরে সহিংস তার রূপ নেয়।" প্রাবন্ধিক সাহেবের এই কথার সাথে আগে স্মরণ যোগ্য যে, জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠাতা এম, এন, লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ পাকিস্তান আমলের শেষ ভাগ থেকে স্বাধীনতা উত্তর দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল।

জুম্ম জনগন আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসনের দাবী সহ ষোল দফা কর্মসূচী নিয়ে ১৯৭০ সনের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এবং ১৯৭২ সনের সংসদ নির্বাচনের জয়যুক্ত করে এম এন লারমাকে সংসদে পাঠিয়ে ছিল। তিনি সংসদে জুম্ম জনগণের আশা-আকাংখা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী বার বার জোড়ালো কণ্ঠে তুলে ধরেছিলেন এবং জুম্ম জনগণের প্রতিনিধি সহ তিনি দফায় দফায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও ও সংবিধান রচনা কমিটির নিকট ও উক্ত দাবীনামা উত্থাপণ করেছিলেন। সমান্তরালভাবে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও পার্বত্য চট্টগ্রামের অনাচে-কানাচে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে দিয়ে ছিল। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠি তখন সদ্য বিজয়ী উগ্র মুসলমান জাতীয়তাবাদে মত্ত। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন হুমকি, জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। প্রাবন্ধিক সাহেব নিজের লেখা বক্তব্যকেও নির্লজ্জ ভাবে অস্বীকার করে আবারো বলতে চান যে — জনসংহতি সমিতি কখনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে নাই বা সশস্ত্র আন্দোলনের অবকাশ নেই? তিনি আরো বলেছেন— "সশস্ত্র আন্দোলন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে"। তাহলে তিনি কি বাংলাদেশের নয় মাস স্থায়ী মৌলিক অধিকার প্রাতিষ্ঠাতার রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামকেও সনন্ত্রাস বলতে চান?

তিনি বলেছেন — "যাদের মাতৃত্ববোধ আছে তাদের মানবতাবোধও আছে।" কিন্তু প্রাবন্ধিক সাহেবের মাতৃত্ববোধ বা পিতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে। সন্তানের পিতা ও নারীর স্বামী হয়েও তিনি তার স্ত্রী ও ঔরসজাত সন্তানদের তার আদি স্থান চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই-এ ছুঁড়ে ফেলে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের করুণ আর্তনাদ তার লৌহ ও পাষান হৃদয়ে কখনো করুণা উদ্রেক করেন নি।

প্রবন্ধে লেখক সাহেব অনেক কথার ফুলঝুড়ি বেড়েছেন। কিন্তু ফুলঝুড়ি ঝাড়তে গিয়ে তিনি কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তথাকথিত সন্ত্রাসী নামে শান্তিবাহিনী তথা জন সংহতি সমিতি সম্পর্কে কেবল গালমন্দ করতেই তার লেখা শেষ হয়ে গেছে। কিভাবে, কোন কারনে ও কোন পক্ষ থেকে প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে তা খুঁজে বের করার ফুরসৎ তিনি পাননি। প্রবন্ধের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে — পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের বস্তু নিষ্ট বিবরণ তুলে ধরার সদিচ্ছা তার আদৌ ছিল না। সরকারী অপপ্রচারের তল্পি বাহক হিসেবে তিনি কেবল সরকারী প্রচারণার দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যকেই পুনরু-লেখ করতে আগ্রহী ছিলেন। এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে এ তিনি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষকতা কালীন তিনি রাঙ্গামাটিতে তার প্রকাশনা ব্যবসা খোলেন এবং রাঙ্গামাটিতে বসে সুদূর স্বস্থানস্থ চাকরীর বেতন অবৈধ ভাবে উত্তোলন করতেন। এতে তার মহৎপেশার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সহজেই আন্দাজ করা যাবে। তার এই চৌর্যবৃত্তি ও নৈতিকতাহীনতার সুবাদে সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা DGFI তাকে জুম্ম জনগনের সশস্ত্র আন্দোলন বিরোধী, সরকারী অপপ্রচারণার কাজে নিয়োগ করে। সুতরাং তিনি সাংবাদিক বা প্রকাশক বাহ্যতঃ যেই মহৎও আদর্শনিষ্ঠ পেশাজীবির লেবাস পড়ুক না কেন, নুন যখন খাচ্ছেন, গুনতো গাইতেই হবে। এখন এমন সুবিধাবাদী ও ভুঁই ফোড় সংবাদিকের কাছ থেকে এ ছাড়া আর কিই বা আশা করা যেতে পারে?

বৌদ্ধভিক্ষু নির্যাতত

অতি সম্প্রতি সংসার ত্যাগী এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেনা বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২২ শে জানুয়ারী, ৯২ ইং তারিখে বাঘাইছড়ি উপজেলায় করেঙ্গাতলী বাজারে মালামাল বেচাকেনা করার সময় শ্রী বিশ্বমুনি চাকমা (২৫) পীং - অপু রঞ্জন চাকমা, গ্রাম - বালুখালী - নামে এক কলেজ ছাত্রকে করেঙ্গাতলী আর্মি ক্যাম্পের এক আর, পি (রেজিমেন্টাল পুলিশ) আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং ক্যাপ্টেন মসিমুর রহমান তাকে অমানবিকভাবে মারধর, নাকে-মুখে পানি ঢালা ও অকথ্য নির্যাতন চালালে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। এর পর জ্ঞান ফিরে এলে সে আর্মিরা যা জিজ্ঞাসা করে সব সত্য ও বালুখালী বৌদ্ধ বিহারে গেলে জানতে পারা যাবে বলে জানায়। এরূপ বলার তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ বিহারে গেলে বিহারের পুরোহিত তাকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

এর পর উক্ত ক্যাপ্টেন (৪৬ বেঙ্গল) ১২ জনের একদল সেনাকে বাজার ঘেরাও করে রাখার নির্দেশ দিয়ে অন্ত ১৫জন সেনা ও বিশ্বমুনিকে নিয়ে উল্লেখিত বৌদ্ধ বিহারে যায়। সেখানে পৌঁছে বিশ্বমুনিকে আবার নির্যাতন করলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে "ভান্তে আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বাঁচান।" এতে বিহারের পুরোহিত, শ্রীমৎ বৌধি মিত্র ভিক্ষু আর্মির ক্যাপ্টেনকে বলেন, "সাহেব সেতো এক নিরীহ কলেজ ছাত্র, একটু মারপিট কমাতে বলুন।" এতে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সেনা সদস্যরা শ্রীমৎ বৌধি মিত্র ভিক্ষু (বালুকা রাম বৌদ্ধ বিহার) কে ভীষণ মারধোর ও বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় বিহারের উঠানে লুটিয়ে দেয়।

আর অন্যান্য সেনা সুন্দার (প্রদেশ্যর্য) বিহারস্থ শ্রমনদের কাঁধে পা দিয়ে বিহারের ছাদে উঠে সমস্ত জিনিষপত্র তচনচ করে দেয়। এর পর পার্শ্ববর্তী ঝগড়া বিল ও মগবান বৌদ্ধ বিহারের সমস্ত জিনিসপত্রাদি তচনচ করে দেয়া হয়। শেষে সন্ধ্যায় সমর বিশ্বমুনিকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলে বাজারে আটক অন্যান্য জুম্মদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

পরদিন ২৩/১/৯২ ইং তারিখে স্কুল কলেজ থেকে ফিরার সময় ঐ ক্যাপ্টেন ৪ জন ছাত্রী (১) মিস্ তরুনিকা চাকমা, (২) মিস্ রুপালী চাকমা, (৩) মিস্ চম্পা চাকমা, (৪) মিস্ জেনস্তারা চাকমাকে ক্যাম্পে নিয়ে তাদের সঙ্গে নানারূপ অশালীন ও অভদ্রোচিত ব্যবহার করে সন্ধ্যায় ছেড়ে দেয়।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সারা মারিস্যা এলাকার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জুম্ম জনগনের মধ্যে এক সংঘাত্তিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৌদ্ধ ধর্মের উপর এই রূপ পরিহানির বিরুদ্ধে মারিস্যা-রাঙ্গামাটি-ঢাকা প্রতিবাদ মিছিল করার লক্ষ্যে মারিস্যা এলাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ২৩/১/৯২ইং এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই প্রতিবাদ মিছিলকে বানচাল ও ধর্মীয় পরিহানির এই জঘন্য ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য মারিশ্যা জোনের জোন কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল হারুন রসিদ (৪৬ বেঙ্গল) উপরোক্ত আহত ভিক্ষুকে ঐ মারিশ্যা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে ও তাকে এলাকাবাসী এবং অন্যান্য ভিক্ষুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। যেহেতু তার সাথে কাউকে যোগাযোগ করতে দেয়া হচ্ছে না। এছাড়া সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে বলে জানা গেছে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের সাথে সাথে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্মের উপর পরিহানির অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার আজ আন্তর্জাতিকভাবে অভিযুক্ত ও আন্তর্জাতিক চাপের সন্মুখীন। আন্তর্জাতিক চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এ ঘটনাকে যে কোন প্রকার ধামাচাপা দিতে মারিশ্যা জোন কম্যাণ্ডার বদ্ধ পরিকর বলে জানা গেছে।

বাঘাইছড়ি উপজেলায় বৌদ্ধ ধর্মের উপর পরিহানির এ ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বা প্রথম ঘটনা নয়। এ এলাকায় ১৯৮৬ সালেও ভি ডি পিদের সহযোগে একদল উন্মত্ত মুসলমান বাঙালী নুতন লাল্যা ঘোনা মনোরম বৌদ্ধ বিহারে আক্রমণ চালিয়ে বৌদ্ধ মূর্ত্তির ভাংচুর, বিষয় সম্পত্তি লুট ও বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাসার ভিক্ষুকে আহত করেছিল। এছাড়া সেনা বাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারীরা একই বৎসরে দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ি উপজেলার শতাধিক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির লুট ও জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যাও করেছিল। ১৯৮৯ সালে লংগদু উপজেলার লংগদু হত্যাকাণ্ডের পর ঐ এলাকার ৭টি বৌদ্ধ বিহার লুট ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরূপ ধর্মীয় পরিহানি ১৯৭১ সাল হতে অদ্যাবধি ঘটে আসছে। বালুকারাম বৌদ্ধ বিহারের ঘটনাটি এইরূপ ধর্মীয় পরিহানির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্মের পরিহানির বিরুদ্ধে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ ১৯৮৯ সালে ঢাকায় এক মৌন মিছিল করেছিল। এবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে যেন সেরূপ কোন প্রতিবাদ মিছিল হতে না পারে সেব্যাপারে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগে গেছে। জুম্ম জনগনের ধারনা ১৯৮৬ সালে লাল্যা ঘোনা মনোরম বৌদ্ধ বিহারের ঘটনার মত এই ঘটনাকে জোর পূর্বক ধামাচাপা দেয়া হবে।

বৌদ্ধ বিহার লুট ও বুদ্ধ মূর্ত্তির ভাংচুর

২৪শে অক্টোবর/৯১ইং

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীরা ১৯৭১ সাল হতে এযাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের পরিহানি করে আসছে। এ ধর্মীয় পরিহানির মধ্যে মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও গীর্জা ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও পবিত্র মূর্ত্তির ভাংচুর করা হয়। বিগত অক্টোবর মাসে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারীরা মহালছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি "জনবল সুদর্শন বৌদ্ধ বিহার" লুট ও বুদ্ধ মূর্তির ভাংচুর করেছে। ২৪শে অক্টোবর অনুপ্রবেশকারীরা উক্ত বিহারের উন্মত্তভাবে প্রবেশ করে বিহারের মূল্যবান সম্পত্তি লুট করে ও পবিত্র মূর্তিগুলিকে বারংবার আঘাত করতে থাকে। এতে বিহারস্থ বড় বুদ্ধ মূর্ত্তিটির গলা ও পিত্তলের তৈরী মূর্তিটির নীচের অংশ ভেঙ্গে যায়। এছাড়া অনুপ্রবেশকারীরা বিহারে টাঙানো বনভান্তের (সাধনানন্দ মহাস্থবির) আয়নায় বাঁধানো ছবি টি আছড়িয়ে ভেঙ্গে দেয়। শেষে বিহারে রক্ষিত ২টি আলমারীর তালা ভেঙ্গে মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নেয়। নিরাপত্তা বাহিনী ছত্রছায়ায় এ ঘটনায় জুম্মরা এর কোন প্রতিবাদ ও বিচার পায়নি।

লণ্ডনে জনসভা

১৫ই ডিসেম্বর' ৯১ লণ্ডনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম কেমপেইন ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগ লণ্ডনের NAZRUL

CENTRE 30, HANBURY ST, EI, ALDGATE EAST TUBE - এ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভার সভাপতিত্ব করেন ড্যান জোনস এবং প্রধান বক্তব্য প্রদান করে জয়ন্তি গ্রেক, (পার্বত্য কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট, চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভাগিনী) মনন গাঙ্গুলী (উক্ত সংস্থার সংগঠক) এবং আয়ুব আলী। সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র না সামরিক শাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি, স্থানীয় প্রশাসনে সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রন, সামরিক সন্ত্রাস, অত্যাচার, ধর্মীয় পরিহানী, নারী ধর্ষণ, জুম্মদের ধরপাকড়, জেল-জুলুম ও সেনা বাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের ভূমিবেদখল প্রভৃতি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী করেন।

উক্ত জনসভাটি লণ্ডনের প্রবাসী বাংলাদেশীদের অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল। আলোচনার শেষে সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সম্মেলন এবং ত্রিপুরার রিলিফ ক্যাম্পের ছুটো ভি ডি ও ছবি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া উক্ত সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জোর দাবী

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ সরকার যতই তালবাহানা করুক না কেন এতে সমস্যার জটিলতা না কমে বরং বেড়েই চলেছে। সরকারের জুম্ম উচ্ছেদ-মূলক কার্যক্রমকে প্রতিহত করার জন্য শান্তিবাহিনীর কার্যক্রমও থেমে থাকেনি বরং আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। এতে ঢাকা প্রশাসন যেমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে তেমনি বাংলাদেশের সচেতন মানবতাবাদী ব্যক্তিগণও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যার আশু সমাধানের জন্য জোর দাবী জানিয়ে যাচ্ছেন।

২৯ শে অক্টোবর' ৯১ইং, রাংগামাটির পৌর মিলনায়তনে ঐ জেলার আওয়ামী লীগ মনোনীত উপজাতীয় সংসদ সদস্য শ্রী দীপংকর তালুকদার পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নেবার জন্য ক্ষমতাসীন বি এন পি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

১২ ই নভেম্বর' ৯১ ইং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ এস এম সোলেয়মান পার্বত্য পরিস্থিতির উপর এক শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন। ১৪ই নভেম্বর' ৯১ ইং শান্তি বাহিনীর হামলায় নিহত ৬ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীর মৃতদেহ নিয়ে ঢাকা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠীত এক শোক শোভায় বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সাইফুল ইসলাম দিল তার পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ও বিরোধী দলসমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনে গোল টেবিল বৈঠকেরও আহ্বান জানান। ১৫ই ডিসেম্বর' ৯১ইং, খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনে ঢাকা-দিল্লী বৈঠকের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের ভার প্রাপ্ত আহবায়ক মঈন উদ্দিন খাদল গত ১৫ই নভেম্বর এক বিবৃতিতে শান্তিবাহিনীর সমস্যার প্রশ্নে কোন উগ্রহটকারী সামরিক বা উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় তাড়িত-না হয়ে বিরাজিত সমস্যার দাবী করেছেন। (নিবন্ধ পার্বত্য ভূমি, ডিসেম্বর/৯১) গত ৫ই ডিসেম্বর' ৯১ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপেইন ও ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে লণ্ডনের অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়।

জুম্ম গ্রামে নির্যাতন ও লুটতরাজ

৬ই নভেম্বর '৯১ই বুড়িঘাট ক্যাম্পের ৮ম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন এর সেনাদের ছত্রছায়ায় নিকটস্থ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা তুংতল্যা (পলিপাড়া', উত্তর হাতিমারা বারমা গ্রামে এক লুটতরাজ অভিযান সংঘটিত করে। উক্ত অভিযানে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামবাসীরা পালিয়ে প্রান রক্ষা করলেও অনুপ্রবেশকারীরা জুম্মদের নিকট হতে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি, গুরু-ছাগল, মুরগী, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, পারিবারিক জিনিসপত্র ইত্যাদি লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। নিম্নে ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মদের কয়েক জনের নাম দেয়া গেল - (১) অংথোয়াই রোয়াজা (৭৪) পীং ক্যয় চাই রোয়াজা। অনুপ্রবেশকারী তার দুইটি হালের বলদ সহ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। ৭/১১/৯১ ইং তারিখে সে অনুপ্রবেশকারীদের গ্রামে নিখোঁজ হয় সকলের ধারণা অনুপ্রবেশকারীরা তাকে গ্রামে গুম করেছে। তার মোট ক্ষতির পরিমান আনু-

মানিক ২০,০০০/- টাকা (২) সুইজ মারমা (৬৫) পীং ক্যর চাই মারমা — ক্ষতির পরিমান ১০,০০০/-টাকা, (৩) আপ্রুছাই মারমা (২৮) পীং অংথোয়াই মারমা — ক্ষতির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা ও (৪) অংক্যজাই মারমা পীং বৃহৎ মারমা — ক্ষতির পরিমান ১৫,০০০/-।

আবার, গত ৬ই নভেম্বর ৯১ইং তারিখে মোঃ কামাল সুবেদার, ইসলামপুর ক্যাম্প (নানাক্রুম), নানিয়ারচর, ৮ম ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এর সেনারা রামহরি পাড়ার (শীলাছড়ি মৌজা, নানিয়ারচর) ১২ (বার) জন নিরাপরাধ জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

৭ই নভেম্বর/৯১ ইং তারিখে মেজর মাহবুব, বুড়িঘাট ক্যাম্প, ৮ম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন এর সেনা সদস্যরা নানাক্রুম মৌজার দক্ষিণ মংখোলা, কেরেটছড়ি, দক্ষিণ হাতিমারা, উত্তর হাতিমারা গ্রামের সরল ও ধর্মপ্রাণ জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়ে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনারা নানিয়াচর এবং কাউখালী এলাকার চৌধুরী পাড়া, বেতছড়ি তৈচাকমা গ্রামসহ এগারটির গ্রাম অমানবিক এবং নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ জুম্মদের নির্যাতন করেছে বলে জানা গেছে।

গত ৪/২/৯২ইং তারিখে মুসলমান বাঙ্গালীরা খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের ১ জন সদস্যসহ ৮ জন জুম্মদের রামগড় হতে খাগড়াছড়ি অভিমুখে যাত্রীবাহী বাস হতে জোর করে নামিয়ে বেদমভাবে মারধর ও নির্যাতন করেছে। অত্যাচারিত জুম্মরা হচ্ছে—

(১) নক্ষত্র ত্রিপুরা (৩৬) পীং নন্দের বাশী ত্রিপুরা, গ্রাম-জগন্নাথ পাড়া, রামগড় উপজেলা, খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্য।

(২) পাইংপ্রুমগ (৩৭) পীং চাইথোয়াংজুন মগ, গ্রাম-চৌধুরী পাড়া, রামগড় উপজেলা, খাগড়াছড়ি।

(৩) মং থোয়াই মগ (১৭) পীং কংজুরীমগ, ঠিকানা – ঐ

(৪) চাথোয়াই মগ (৪০) পীং মনে মগ, গ্রাম-নাইমুনি-পাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি।

অন্যান্য ৪ জন জুম্মদের মধ্যে জনৈক ত্রিপুরার নাম জানা যায়নি। সে নকুল চন্দ্র ত্রিপুরার বড় ভাই ভুবন ত্রিপুরা (জেলা পরিষদ সদস্য) এর নাতী। অন্য ৩ জন চাকমা যুবক। তাদের নাম জানা যায়নি।

জুম্ম নারী ধর্ষণ

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক মা ও মেয়ের ধর্ষিতা হওয়ার এক সংবাদ পাওয়া গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, গত ২৭শে অক্টোবর/৯১ইং, খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি জোনের ২৪ নং ও ২৭ নং ইবি আর সদস্যরা এক যৌথ অপারেশনের সময় মহালছড়ি উপজেলার গোলাকাপ্যা পাড়ার শ্রীমতি রংপতি চাকমা (৩৮) স্বামী শ্রীবৈকুণ্ঠ চাকমা ও তার কিশোরী মেয়ে শ্রীমতি চঞ্চলা চাকমাকে (১৩) কয়েকজন সেনা সদস্য পাশবিকভাবে ধর্ষণ করে। বর্তমানে এই ধর্ষিতা মা ও মেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলে জানা গেছে।

উক্ত ঘটনায় এলাকার জনগণের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু অসহায় জুম্মদের সুবিচার পাওয়ার কোন কর্তৃপক্ষ নেই। তাই জুম্মরা হতাশাগ্রস্থ ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

০৬ই নভেম্বর/বুড়িঘাট সেনা ক্যাম্পের ৮ই ইঞ্জিঃ কোর এর মেজর মুনির ও তার সেনা সদস্যরা নানিয়ারচরের নিম্নোক্ত জুম্ম নারীদেরকে ধর্ষণের চেষ্টা করে—

১। শ্রীমতি পরান সোনা চাকমা (১৮) পীং পুতুল চাকমা, গ্রাম - দক্ষিণ হাতিমারা, ৭০ নং হাজাছড়ি মৌজা, নানিয়াচর উপজেলা। সেনা সদস্যরা তাকে নিজ বাড়ীতে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেনা সদস্যরা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

২। শ্রীমতি প্রণীতা চাকমা (২২) স্বামী-পংকজ চাকমা, ঠিকানা-ঐ, তাকেও ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সেনা সদস্যরা তার ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয়।

৩। শ্রীমতি বসুন্ধরা চাকমা (২৭) স্বামী - পীং - বিরাজমনি চাকমা, ঠিকানা - ঐ, তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দেহ মিলনে রাজী করাতে না পেরে জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। এতে সে বাধা দেয় ও চিৎকার করে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

১৬-১১-৯১ইং, তারিখে উক্ত সেনা সদস্যরা আবার একই গ্রামে অপারেশনের সময় নিম্নোক্ত নারীদেরকে ধর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় —

১। শ্রীমতি রূপতি চাকমা (২৩) স্বামী-সুনীল জীবন চাকমা, ঠিকানা - ঐ, সেনা সদস্যরা তাকে ধর্ষণ করার জন্য টেনে হেঁচড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকানোর চেষ্টা করলে সে চিৎকার করতে থাকে। এতে সেনা সদস্যরা ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে ছেড়ে দেয়।

২। শ্রীমতি আলো রাণী চাকমা (১৬) পীং-চারু মোহন চাকমা, ঠিকানা-ঐ তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করে। এতে সেনা সদস্যরা তার গাল ও স্তনে কামড় দিয়ে ছেড়ে দেয়।

৩। শ্রীমতি সুচরিতা চাকমা (১৪) পীং আনন্দ মোহন চাকমা, ঠিকানা-ঐ, এই কিশোরীকে সেনা সদস্যরা ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করে ও একজন সেনার হাতে কামড় বসিয়ে দেয়। এতে সে ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়।

৪। শ্রীমতি অমলিকা চাকমা (১৬) পীং - রবি চাকমা ঠিকানা কেল্লেট ছড়ি, নানিয়াচর উপজেলা। সেনা সদস্যরা তাকে ধর্ষনের চেষ্টা করলে সে চিৎকার করে ও পার্শ্ববর্তী বাড়ী হতে ৭০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাকে উদ্ধার করতে এলে সে ধর্ষনের হাত থেকে রেহাই পায়। কিন্তু সেনা সদস্যরা তাকে ধর্ষনে ব্যর্থ হয়ে বন্দুকের বাথ দিয়ে আঘাত করে।

এছাড়া জুরাছড়ি ক্যাম্পের কমাণ্ডার সুবাদার জমাজ্জল হোসেন ৮ম ইস্টঃ ব্যাটালিয়ন, নানিয়াচর, নানিয়াচর জোন, নিম্নোক্ত জুম্ম নারীদেরকে ক্যাম্পের সম্মুখস্থ গোলঘরে জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এরা হচ্ছে —

১। ঝর্ণা দেবী চাকমা (১৫) পীং - কান্দারা চাকমা, গ্রাম - ইটছড়ি- ইটছড়ি মৌজা, খাগড়াছড়ি। ১১।১২।৯১ ইং তারিখে ধর্ষিতা হয়।

২। আনন্দ মালা চাকমা (১৭) পীং - বেরওয়া চাকমা, গ্রাম কাঠালছড়ি, বুড়িঘাট মৌজা, নানিয়াচর। তাকে ১৩।১২।৯১ ইং তারিখে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৩। কালাবি চাকমা (১৬) পীং - কিষ্ট চাকমা, গ্রাম - মাইচছড়ি, ছোট মহাপ্রুম মৌজা, নানিয়াচর। তাকে ১৬।১১।৯১ ইং তারিখে ধর্ষনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৪। দয়া রাণী চাকমা, পীং সত্য চাকমা গ্রাম - ভালুক ছড়ি, গিলাছড়ি মৌজা নানিয়াচর। তাকে ১৯।১২।৯১ ইং তারিখে ধর্ষনের অপচেষ্টা চালায়।

৫। বসুন্ধরী চাকমা (১৪) পীং - বিরাজ মোহন চাকমা, গ্রাম দক্ষিণ হাতিমারা, বুড়িঘাট ক্যাম্পের সৈনারা ১৬।১১।৯১ ইং তারিখে ধর্ষনের চেষ্টা চালায়।

শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা

০১-১০-৯১ ইং, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার তুল্যাতলী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা বানরকাটা নামক জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে অপারেশন চালানোর পর ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তনের পথে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এক ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ১ জনকে নিহত ও অপর জনকে মারাত্মক ভাবে আহত করে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অক্ষত অবস্থায় নিরাপদ স্থানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

২৪-১০-৯১ ইং, মহালছড়ি উপজেলার ২৪৯ নং কেয়াং ঘাট মৌজার উলটাছড়ি ভিতর পাড়ায় শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আর্মিদের উপর সশস্ত্র হামলা চালালে ২ জন আর্মি নিহত হয়। নিহত আর্মিদের নাম জানা যায়নি।

৩০-১০-৯১ ইং, পানছড়ি উপজেলার বি ডি আর ক্যাম্পের পানি পয়েন্ট শান্তি বাহিনীর সদস্যরা মর্টার সেলিং ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সহায্যে হামলা চালালে মোঃ আবদুল খালেক নামে বি ডি আর এক জোয়ান ঘটনাস্থলে মারা যায় ও অপর ৩ জন ঘোরতরভাবে আহত হয়।

১২-১১-৯১ ইং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাস্থ বাবুছড়াতে বসতিকারী মুসলমান বাঙ্গালীদের একটি দল উপজাতীয়দের রেকর্ডভুক্ত বাগানে জোর পূর্ব্বক গাছ-বাঁশ কাটতে গিয়ে শান্তি বাহিনীর আক্রমনের সম্মুখীন হয়। এতে নুরুল ইসলাম নামে একজন বসতিকারী নিহত ও অপর ৩ জন আহত হয়

০৬-১২-৯১ ইং তারিখে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা দীঘিনালা উপজেলার বোয়াল খালীস্থ একটি সেনা সেন্ট্রিপোষ্টে আক্রমণ চালিয়ে জাহাঙ্গীর নামে একজন আর্মিকে নিহত ও ২ জনকে আহত করে। এ আক্রমণের সময় দুইপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয় এবং শান্তিবাহিনীর একজন সদস্য আহত অবস্থায় সেনা সদস্যদের নিকট ধরা পড়ে।

১৪-১-৯২ ইং তারিখে নানিয়াচর থানাধীন দাচা পাড়া নামক এক গ্রামে সেনা বাহিনীর বাহিনীর এক পেট্রল পার্টির উপর হামলা করা হয়। হামলায় একজন আর্মি সদস্য নিহত ও একজন আহত হয়।

১৫-১-৯২ ইং তারিখে মহালছড়ি থানাধীন বাজেছড়া নামক স্থানে আর্মীর পেট্রল পার্টির উপর হামলা করে একজন আর্মী সদস্যকে নিহত ও ২ জনকে আহত করা হয়।

১৬-১-৯১ ইং তারিখে লক্ষীছড়ি থানাধীন নবাঙ্গা ডুয়ার নামক স্থানে আর্মীর একটি দলের উপর হামলা করা হয়। এই দলটি নিকটবর্তী গ্রামে অপারেশন চালাচ্ছিল। ঘটনায় একজন ক্যাপ্টেন, একজন সুবেদার ও একজন জোয়ান নিহত এবং অন্য একজন আহত হয়।

১৯-১-৯২ ইং তারিখে দিঘীনালা থানার তিবিরা ছড়া নামক স্থানে আর্মীর একটি দলের উপর হামলা করা হলে মেজর হারুন ও একজন সুবেদার নিহত এবং অন্য একজন আহত হয়। মেজর হারুন ও তার এই দলটি জুম্ম গ্রামে অপারেশন চালাচ্ছিল।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনাঃ তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।